ট্রিপস (TRIPS) চুক্তি: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সময়সীমা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'নো রোল ব্যাক' শর্ত প্রত্যাহার করতে হবে; স্বল্পকালীন সময়সীমা বৃদ্ধি বাস্তবসম্মত নয়

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দরিদ্রতর এবং অধিকতর বিপন্ন সদস্য দেশ, যেসব দেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবেও পরিচিত, তাদের জন্য ট্রিপস চুক্তির অনেক বাধ্যবাকতা পুরণে নবায়নযোগ্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। দেশগুলোর বিশেষ প্রয়োজন, নানাবিধ সমস্যা এবং একটি যথাযথ প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে এই ছাড় প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে এই ছাড় ২০০৫ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কথা থাকলেও ঐ বছরই সময়সীমা ১ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

২০১২ নভেম্বরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তিতে দেয়া অধিকার বলে (ট্রিপস ধারা ৬৬.১) স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প¶ থেকে একটি প্রস্াব করা হয়, যাতে এই সময়সীমা তাদের 'স্বল্পোন্নত' অবস্থা থেকে বের হয়ে আসা পর্যন্ত শর্তহীনভাবে বাড়ানো হয়। আইনগতভাবে, ট্রিপস চুক্তি অনুসারে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরাই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এই প্রস্াব অনুমোদন করতে পারে। ট্রিপস-এর ৬৬.১ ধারা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এক্ষত্রে সন্দেহাতীত অধিকার থাকলেও ধনী দেশগুলো (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) তা ধারাবাহিকভাবে অস্বীকার করে আসছে।

তারা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য অনেকগুলো শর্তসাপেক্ষে স্বল্পকালীন (৫ বছর) ছাড় দেয়ার একটি অবাস্ব ও দুর্বল প্রস্াব দিয়েছে। বিশেষ করে, 'নো রোল ব্যাক' নীতির কথা উলেস্নখ করা যেতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ একবার মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগ শুরম্ন করলে তা থেকে আর পিছিয়ে আসতে পারবে না (মেধাস্বত্ব আইনের কিছুটা নমনীয় প্রয়োগও তারা করতে পারবে না।)

এই বিশেষ রচনার প্রথম পর্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে কেন 'নো রোল ব্যাক' শর্ত গ্রহণযোগ্য নয় তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং তৃতীয় পর্বে স্বল্পকালীন ছাড় কেন বাস্তবসম্মত নয়, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম পর্ব: স্বল্পোন্নত দেশ কারা?

তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে একটি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সেগুলো হলো: মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই), মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক বিপন্নতা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর সহযোগী অংশ কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি প্রতি ৩ বছর পর পর স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য পুনর্নির্ধারণ করে এবং এ অবস্থা অতিক্রম করা দেশগুলো সম্বন্ধে ইকোসকে মতামত পাঠায়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলো সত্যিকার অর্থেই দারিদ্র্যপীড়িত। নিচের পরিসংখ্যান স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবস্থা তুলে ধরে:

- **দারিদ্র্য:** অর্ধেকেরও বেশি মানুষ দৈনিক ১.২৫ ডলারেরও কম আয়ে বেঁচে থাকে। কিছু দেশে অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, যেমন বুরম্নন্ডি (মোট জনসংখ্যার ৮১%), মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র (৬২.৬%), শাদ (৬১.৯%), মাদাগাস্কার (৭২.১%) মালাওয়ি (৭৩.১%) এবং মায়ানমার (৬৭.৪%)।

- **শি¶া:** স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বয়স্ক শিড়্গার হার গড়ে ৬০.৭%, মাধ্যমিক শিড়্গা লাভকারী পুরম্নষ ২৭% এবং নারী মাত্র ১৭%। উচ্চশিড়্গায় ভর্তি হয় মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬.৬%। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ৪০.৯%। ২০১০ সালে বিদ্যালয়ে পড়ার গড় সময় ছিল ৩.৭ বছর।

- **মৃত্যুহার:** ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ২৭%-এর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম। ২০১০ সালে ৫ বছরের কম বয়সী প্রতি ১০০০ জনে মৃত্যুর হার ছিল ১০। ২০০৯ সালে প্রতি হাজারে বয়স্ক মৃত্যুহার ছিল নারী ২৮২ ও পুরম্নষ ৩৫৭। ২০০৮ সালে প্রতি হাজারে ৪৫৯টি মৃত্যু হয়েছে নানা ধরনের হৃদরোগ ও ডাবেটিক রোগের কারণে।

- **বয়স্কদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার:** স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মোট জনগোষ্ঠীর ২.৯% এইচআইভিতে আক্রান্ত। কিছু দেশে এই হার ১৪% থেকে ২৪%।

- **উৎপাদন ড়্গমতা:** প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক খাতের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় উৎপাদন সড়্গমতা কম। ২০১০ সালে বিশ্বের মোট রপ্তানিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত অবদান ছিল মাত্র ০.৮৮২৬%।

- **ব্যক্তিগত কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার:** মাত্র ১.৭% জনের কম্পিউটার আছে, মাত্র ৫% জন ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।

- **বিদ্যুৎ:** স্বল্পোন্নত দেশের ৫০% মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পায় না।

- **পানি ও স্যানিটেশন:** ২০১০ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় মাত্র ৬৭% এর জন্য পানির উন্নত উৎস ছিল। ৩৬% এর জন্য ছিল পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা।

- **গবেষক:** ২০০২ থেকে ২০১০ এক হিসাবে দেখা যায়, এই সময়ের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রতি মিলিয়ন লোকের মধ্যে গবেষক ছিল খুবই কম; মায়ানমারে মাত্র ১৮.৪ জন, মাদাগাস্কারে ৪৬.২ জন, লেসেথোতে ২১, জাম্বিয়ায় ৪৩, রম্নয়ান্ডায় ১২ এবং মালাওয়িতে মাত্র ৩০ জন।

- **উৎকর্ষতার সুচক:** স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তি উন্নতির গতি খুবই ধীর। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা পরিমাপের বিভিন্ন সুচকই এটা প্রমাণ করে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সকল ধরনের সুচকেই নিচের দিকে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় পর্ব: 'নো রোল ব্যাক' (No-Roll-Back) ধারা বাদ দিতে হবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ট্রিপস চুক্তিতে ছাড়ের সময়সীমা বাড়ানোর ড়্গেত্রে 'নো-রোল-ব্যাক' শর্ত আরোপের চেষ্টা করছে। কারণ, সময় বাড়ানোর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই শর্তটির কথা বলা হয়েছিল। এই শর্ত অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত

দেশগুলো যদি মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগ শুরম্ন করে তাহলে আর সেখান থেকে ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না। স্বল্পোন্নত দেশগুলো সম্মিলিতভাবে সময়সীমার বিপরীতে যে কোনও শর্ত আরোপের বিরোধিতা করেছে, কারণ এই ধরনের শর্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলো বিশেষ ছাড়ের যে অধিকার ভোগ করবে তা বাধাগ্রস্ত করবে।

যেসব কারণে এই নো-রোল-ব্যাক শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়;

(ক) মুল ট্রিপস চুক্তিতে এ ধরনের কোনও শর্তের কথা বলা হয়নি, তাই এটি ট্রিপস চুক্তির অতিরিক্ত একটি শর্ত। ৬৫.৫ ধারায় এরকম শর্তের কথা বলা থাকলেও সেটা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। উন্নয়নশীল দেশ ও যেসব দেশ উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাদের জন্য।

(খ) এই শর্ত মুল চুক্তির ৬৬.১ ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ৬৬.১ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, ট্রিপস কাউন্সিল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে সময়সীমা বাড়ানোর কোনও যৌক্তিক অনুরোধ পেলে তাতে সম্মতি দেবে। এতে আরও বলা আছে যে, চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত কোনও শর্ত আরোপ করা যাবে না।

(গ) ট্রিপস চুক্তির ভূমিকা ও ৬৬.১ ধারায় যেভাবে বলা হয়েছে তার মুল চেতনার সঙ্গে এই শর্ত সাংঘর্ষিক। চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে আইন ও নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি সক্ষমতার পরিবেশ তৈরির জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করা হবে। নো-রোল-ব্যাক স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এ ধরনের নীতিগত সুবিধা প্রদানের ঠিক বিপরীত। মেধাস্বত্ব আইন স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, আর এই শর্ত তাদের মেধাস্বত্ব আইন গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করবে।

(ঘ) প্রস্তাবিত এই শর্ত অনুচিৎ। ট্রিপস চুক্তির সমঝোতা প্রক্রিয়ায় কখনই এই ধরনের কোনও শর্তের কথা বলা হয়নি। আর এটা থাকলেও তা ৬৫.৫ ধারার আওতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর এই শর্ত চাপিয়ে দিয়ে উন্নত দেশগুলো ট্রিপস চুক্তির সংশোধন আনতে চাচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মুল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এক্স (৩) ধারা অনুযায়ী, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ধরন পরিবর্তন করে, এমন কোনও সংশোধনী আনতে হলে তা সংস্থাটি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে হতে হবে এবং প্রতিটি সদস্য দেশকে সংস্থার মহাপরিচালক বরাবর তা গ্রহণ করার কথা জানাতে হবে। উন্নত দেশগুলো যদি স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নো-রোল-ব্যাক শর্ত মানাতে চায় তাহলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে তাদের প্রস্তাব পাঠাতে হবে।

(ঙ) ইতিহাসে দেখা যায়, ট্রিপস চুক্তির আগে মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগের শিথিলতা উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় ধরনের দেশকেই নিজেদের উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তা (জ্ঞান অর্জন, প্রযুক্তির উন্নয়ন) পূরণে সহায়ক হয়েছে। অনেক উন্নত দেশই (জাপান, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড) তাদের উন্নয়নকালীন সময়ে গুরম্নত্বপূর্ণ অনেক খাতকে (খাদ্য, রসায়ন ও ঔষধ ইত্যাদি) স্বত্ব আইনের বাইরে রেখেছে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জনগণের জ্ঞান অর্জন সহজলভ্য করার জন্য বিদেশি লেখকদের কপিরাইট অধিকার দেয়নি।

নো-রোল-ব্যাক নীতি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং নিজেদের বিপন্ন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে। উদাহরণ স্বরূপ ঔষধ উৎপাদনের কথা বলা যায়। রম্নয়ান্ডা সম্প্রতি ২০০৯ সালের একটি আইন সংশোধনের মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনকে মেধাস্বত্ব আইনের বাইরে রেখেছে। দেশটির ১৯৬৩ সালের আইনে এ ধরনের কোনও সুযোগ ছিল না। উগান্ডাও একটি আইন করতে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে ঔষধ শিল্পকে মেধাস্বত্ব আইনের বাইরে রাখা যাবে। এটা করা সম্ভব হচ্ছে কারণ, ২০০২ সালে ঔষধ শিল্পকে মেধাস্বত্বের বাইরে রাখার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল (আইপি/সি/২৫) এবং সেখানে নো-রোল-ব্যাক নীতির কথা বলা ছিল না।

(চ) নো-রোল-ব্যাক শর্ত ঔষধি পণ্য ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সমস্যা তৈরি করবে। ২০০৪ সালে ট্রিপস কাউন্সিল ২০১৬ পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ঔষধ সংক্রান্ত পণ্যের ব্যাপারে পেটেন্ট আইনে ছাড় দেয়। এই সিদ্ধান্তের কোথাও নো-রোল-ব্যাক শর্তের উলেস্নখ ছিল না। এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ঔষধ উৎপাদন সহজ করতে এই খাতকে মেধাস্বত্ব সুরক্ষার বাইরে রাখা হয়। তবে, এখন সেই ছাড়কৃত সময়সীমা শেষ হওয়ার পথে এবং এখন পর্যন্ত এটা পরিষ্কার নয় যে, সময়সীমায় নতুন কোনও ছাড় দেয়া হলে তার সঙ্গে নো-রোল-ব্যাক শর্ত জুড়ে দেওয়া হবে কিনা। এটা হলে সুলভ ঔষধের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে চরম বিপর্যয়ে পড়তে হবে। এটাও স্পষ্ট যে, এই শর্ত ঔষধ উৎপাদনে ছাড় দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলবে।

একটি কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে এবং উচ্চ মৃত্যুহার রোধ করতে ঔষধ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সকলের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে অপারেশনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন ইমপস্নানটেবল পেসমেকার, পালস জেনারেটর, অটোমেটেড এক্সটারনাল ডিফাইব্রিলেটর, বস্নাড ভেসেল স্টেনস, শল্য চিকিৎসার নানা প্রযুক্তি প্রয়োজন। ক্রয়সাধ্য মুল্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে এগুলো পাবার পথে কপিরাইট বা পেটেন্ট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নো-রোল-ব্যাক শর্ত চিকিৎসা সামগ্রী বা প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও তাতে সহজ প্রবেশাধিকারকে ব্যাহত করবে। চিকিৎসা পণ্য উৎপাদনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এ ধরনের শর্তের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না।

(জ) নো-রোল-ব্যাক শর্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করবে। এই লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে হলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি, শিক্ষা উপকরণ, পানি বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি, জলবায়ু বান্ধব প্রযুক্তি, চিকিৎসা পণ্য এবং প্রযুক্তিতে সহজ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

(ঝ) ২০১১ থেকে ২০২০ সালের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর 'প্রোগ্রাম অব এ্যাকশন' বাস্তবায়নের উপর জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আবিষ্কার এবং জ্ঞান উৎপাদনে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনা করা ঠিক হবে না। নিজেদের দেশের মানুষের জন্য অত্যাবশকীয় পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে এইসব দেশ মেধাস্বত্ব আইনের বিশেষ সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি। প্রতিবেদনে বলা হয়, একটি কাঠামোগত রূপান্তরের জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অধিকতর প্রবেশাধিকার প্রয়োজন।

ধারা ৬৬.১ এর আওতায় প্রযুক্তিগত ভিত্তি অর্জন এবং জ্ঞানের ঘাটতি কমানোর জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে যে সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, নো রোল ব্যাক শর্ত সেখানে পরিষ্কার বাধা সৃষ্টি করবে।

(ঞ) অনেক স্বল্পোন্নত দেশ ট্রিপস চুক্তির আগেই কিছু আইন বাস্তবায়ন করে আসছিল এখন তারা সেসব পুনর্বিবেচনার প্রক্রিয়ায় আছে। দেশগুলো যদি মেধাস্বত্ব আইনের ক্ষেত্রে নো-রোল-ব্যাক শর্ত পালন করতে যায় তাহলে সেটা তাদের পদক্ষেপকে দারম্নণভাবে বাধাগ্রস্ত করবে।

(ট) কিছু স্বল্পোন্নত দেশ অতি সম্প্রতি তাদের আইন সংশোধন করেছে। এটা অবশ্য এখনই বলা কঠিন যে, এসব আইন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বা অন্যান্য বাধা টপকানোর ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক বা সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে। তারা এখনও এগুলো নিয়ে কাজ করছে। একটি জাতি হিসেবে তাদের উন্নয়নের এটা ভূমিকা রাখতে পারে, আবার নাও পারে। একটি কঠিন শর্ত চাপিয়ে দিয়ে মেধাস্বত্ব আইনের ক্ষেত্রে দেশগুলো যে বিশেষ ছাড় ভোগ করতো তাকে বাধাগ্রস্ত করা হবে এবং এতে তাদের নিশ্চিত কিছু উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এটি ঐ দেশগুলোর জন্য কোনভাবেই মঙ্গলজনক হতে পারে না।

(ঠ) ডবিস্নউআইপিও (ডওচঙ) স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রধান কারিগরি সহায়তা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বছরে সংস্থাটির আইনী সহায়তার বিষয় নিয়ে গুরম্নতর উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, সংস্থাটির কারিগরী সহায়তার মধ্যে উন্নয়নমুখী প্রবণতার অভাব রয়েছে এবং দেশগুলোর উন্নয়ন চাহিদা বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এই সংস্থাটির কারিগরি সহায়তায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যে মেধাস্বত্ব আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো তাদের উন্নয়নের জন্য যথাযথ নয়, এটি বরং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে পুরনো কিছু আইনে ফিরে যেতে বাধ্য করছে।

(ড) উরম্নগুয়ে রাউন্ডে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। একটি সিদ্ধান্তে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত পোষণ করে বলেছিল যে, উরম্নগুয়ে রাউন্ডের চুক্তি ও শর্তগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রযোজ্য হবে, যার সঙ্গে নো-রোল-ব্যাক শর্ত সাংঘর্ষিক।

(ঢ) নো-রোল-ব্যাক শর্ত যে আগে কখনও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য কোনও সুবিধা দিয়েছে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং শর্তের ফলে দেশগুলোর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তাদের মাথাপিছু উৎপাদন ২০০৫ সালের ৫.৭% থেকে ২০১১ সালে এসে ১.২% তে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে তেমন ভাল কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেশগুলোকে আসন্ন অর্থিক সমস্যা ও মন্দাসহ আরও দীর্ঘ অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

তৃতীয় পর্ব: সাময়িক সময় বৃদ্ধি বাস্তবসম্মত নয়

স্বল্পোন্নত অবস্থা পেরিয়ে আসার আগ পর্যন্ত ট্রিপস চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়ার সুযোগ দাবি করেছে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। দেশগুলোর নানাবিধ সংকট ও বাধা বিবেচনা করলে এই দাবিকে যুক্তিসঙ্গাই বলতে হবে।

(ক) ৬৬.১ ধারায় একটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য চুক্তিটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত অবস্থা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত ছাড় দেবার কথা বলা হয়েছে। এ কারণেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নতুন প্রস্তাব ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ীই সমর্থনযোগ্য। প্রস্তাবিত সময়সীমা হিসেবে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে স্বল্পোন্নত অবস্থা অতিক্রম করা পর্যন্ত।

একটি দেশ স্বল্পোন্নত অবস্থা অতিক্রম করতে পারল কিনা তার নির্ভর করে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জনের উপর এবং জাতিসংঘের ইকোসোক এর উন্নয়ন নীতি কমিটির (টঘ ঈড়সসরঃঃবব ড়হ উবাবষড়ঢ়সবহঃ চড়ষরপু ঃড় উঈঙঝঙঈ) সুপারিশের উপর।

(খ) ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশগুলো ১০ বছরের একটি বিশেষ ছাড় পেয়েছিল (১ জুলাই ২০১৩ সাল পর্যন্ত) এবং ঔষধ খাতের জন্য এই ছাড় দেয়া হয়েছিল ২০১৬ পর্যন্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময়সীমা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করে, এই সময় আরও বাড়ানো হবে কিনা, এর সঙ্গে নতুন কোনও শর্ত আরোপ করা হবে কিনা- এ নিয়ে। এটি তাদেরকে ট্রিপস মানদন্ডের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধ্য করে। এর ফলে তাদের জন্য যে সুযোগ ছিল সে সুযোগ ব্যবহারে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সময়সীমার ছাড়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে একটি দীর্ঘমেয়াদী সময়সীমা প্রয়োজন। জরম্নরি বিভিন্ন খাতকে পেটেন্টের বাইরে রাখার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করার জন্য সময় চাই। অনেক সময় একাজে বছরের পর বছর লেগে যায়। বিশেষ ছাড়ের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার আগে দেশগুলোকে নিশ্চিত হতে হবে যে, এই ছাড় হবে দীর্ঘমেয়াদী এবং সেখানে নতুন কোনও শর্ত আরোপ করা হবে না।

২০০২ সালে ঔষধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ছাড় সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য বেশ কয়েকটি দেশ পেটেন্ট আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের গতি খুবই ধীর। উগান্ডা ২০০৯ সালে শিল্পস্বত্ব আইন প্রণয়ণের জন্য বিল আনে, সেটা এ বছর কার্যকর হলেও, আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সেই বিশেষ সুবিধার সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর এটি উগান্ডার জনগণ ও সাধারণ ঔষধ উৎপাদক ও ঔষধকে সহজলভ্য করার জন্য বিনিয়োগকারী বিদেশিদেরকে একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। কাজেই, স্বল্পকালীন ছাড় কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(গ) স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবস্থা আসলেই করম্নণ। বিদ্যমান বাস্তবতায় এটা স্পষ্ট যে, ট্রিপস চুক্তি থেকে এই দেশগুলো কোনও সুবিধা নিতে অক্ষম। যখন একটি দেশের জনগণ চরম দরিদ্র, শিক্ষা পেতে অবিরত সংগ্রাম করে চলছে, বিদ্যুৎ, পানি, পয়নিষ্কাশনের মতো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যাদের নেই, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার যাদের খুবই সীমিত- তারা মেধাস্বত্ব আইন দ্বারা উপকৃত হবে, তা বলা খুবই কঠিন। তাদের জন্য কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, যেগুলোর অভাবে সেই দেশগুলো এখন ভুগছে। আর এগুলো নিশ্চিত করতে কয়েক দশক সময় লাগবে, কয়েক বছর নয়।

পূর্বেকার স্বল্পকালীন সময়সীমা পরিষ্কারভাবেই ট্রিপস চুক্তির পুরো বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে একটি দীর্ঘকালীন সময়সীমাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গাত এবং বাস্তবসম্মত।

সূত্র: LDC EXTENSION: "No-Roll-Back: Clause Should be Rejected; Short Extensions Are Impractical